আমরা নাগরিক

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা নাগরিক

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞান প্রকাশন
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ ॥
॥ পুনর্মুদ্রণ ১৯৮২ ॥

মূল্য : দুই টাকা মাত্র

ছয় রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা নয়, জ্ঞান প্রকাশনের পক্ষ হইতে মহেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক প্রকাশিত ও দুই শ' নয়-এর/এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-ছয়, দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর পক্ষ হইতে শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ উৎসর্গ ॥

স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের হাতে
আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার
সঙ্গে তুলে দিলাম—

১।৩ রাধামাধব গোঁসাই লেন,
কলিকাতা—৩
শিবরাত্রি।

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছয় র
হইতে
সরণি,

আমরা নাগরিক

আমি পুলিশ।

আমার কাজ শান্তি রক্ষা করা।

জরুরী তার এলো।

নন্দীগ্রামে দাঙ্গা লেগেছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আদেশ দিলেন। এখনই যেতে হবে।

সন্ধ্যে হয় হয়।

আমরা নন্দীগ্রাম ছেয়ে ফেললাম।

দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা নন্দীগ্রামের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করেছে। শান্তি রক্ষার ভার আমরা নিলাম। টহল দিতে লাগলাম নন্দীগ্রামের পথে পথে। দাঙ্গা থেমেছে। কিন্তু ভয় যায়নি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।

নন্দীগ্রামের বালক বিদ্যালয়ের সামনে জনতার ভীড়। এই অশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে এত মানুষের ভীড় কেন? এগিয়ে গেলাম। অবাক হলাম হিরুদাকে দেখে।

বিদ্যালয়ের সামনে হিরুদা দাঁড়িয়ে।

গায়ে আধ-ময়লা ছেঁড়া পাঞ্জাবী। পরনে পায়জামা। সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। হিরুদা তাদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। হিরুদাকে দেখে মনটা খুশিতে উপচে গেল।

আমি এখন কর্ম্মরত।

শান্তিরক্ষক। তাই জনতার পিছনে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জনতা শান্ত। সকলেই হিরুদার কথা শুনছে। আমিও শুনতে লাগলাম।

হিরুদার কথা শুনতে শুনতে ভুলে গেলাম বর্ত্তমানকে।

নিজের অজান্তে মন চলে গেল এক অখ্যাত গ্রামে।

খুব বেশী দূর নয়।

গোকুলপুর ষ্টেশনে নেমে ঐ অঞ্চলের একমাত্র পাকা রাস্তাটা ধরে উত্তর দিক বরাবর সোজা যেতে হবে। মাইল পাঁচেক গিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে আধপোয়া রাস্তা ধেনো জমির আল ধরে গেলেই পাওয়া যাবে সুন্দর

ছায়াঘেরা একটি গ্রাম। গ্রামটি আজও অখ্যাত। কিন্তু জনসংখ্যা কোন দিনই কম ছিল না। এক সময় ঐ দাসপুর গ্রামের শিক্ষার সূত্র ছিল জমিদার কেশবদাস দত্তর সাহায্য-পুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। হিরুদা দাসপুরের একটি রত্ন বিশেষ ছিল।

হিরুদার বংশ পরিচয় ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

সামান্য একজন ভাগচাষীর ছেলে হিরুদাকে দেখলে সেদিনের বিশেকে কেউ চিনতে পারবে না।

নগেন পালের অনেক আশা ছিল।

নিজে খেটে মা-মরা ছেলেটার জন্যে বিঘে দু'য়েক জমি কিনবে। এজন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। জমিহীন কৃষকের একমাত্র স্বপ্ন ছিল দু-বিঘে ধান জমি। নিজের জন্য নয়। তার একমাত্র সম্বল আদরের বিশের ভবিষ্যৎই ছিল তার একমাত্র চিন্তা।

নগেন পালের আরও একটা আশা ছিল।

তার বিশে লেখাপড়া শিখবে। জীবনের মাঝখানে এসে সে বুঝেছে লেখাপড়া না-জানার অনেক দুঃখ। এই ত সেদিনের ঘটনা। আলিনগর

থেকে তার দাদা চিঠি দিয়েছে। পয়সা না থাকায় তার দাদা এক বৃদ্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে। নগেন পাল মনে মনে দুঃখ করেছে। আজ যদি সে লেখাপড়া জানত তাহলে দাদার চিঠি সে জীবন মাহাতোকে দিয়ে পড়াতো না। সকলকে বুঝিয়ে দিত এ নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

নগেন পালের দুঃখ বিশে দূর করেছিল।

দু বিঘে জমি নিয়ে নয়। তার শিক্ষা দিয়ে। বিশে যে আদর্শ হতে পারে এর প্রকাশ শিশুকালেই দেখা দিয়েছিল। বাপকে চাষে সাহায্য করেও সে পড়াশুনা করত। শৈশবকালেই তার মেধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এক দিনের ঘটনা।

বিশের বয়স তখন দশ বছর। ফিরছিল ক্ষেত থেকে। বাবা নগেন পালের খাবার পৌঁছে দিয়ে। সময়টা ছিল মধ্যাহ্ন। বাড়ির পথে একটা পুকুর পড়ে। বিশে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। দেখল—ঘাটের কাছে পুকুরের জলে একটা মাথা ভেসে উঠে ডুবল। বিশে এক মুহূর্ত দেখল।

মাথাটা আর একবার দেখা দিতেই দশ বছরের বালকের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সে সব ভুলে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল।

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে কিছু লোক জমা হয়েছে। বালকের কাণ্ড দেখে তারা বিস্মিত, আতঙ্কিত। কিন্তু বিশে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই বিশে ডাঙ্গায় ফিরল। একা নয়। তার হাতে বছর দুয়েকের একটি অচেতন মেয়ে। সকলে এগিয়ে গেল। তুলে নিয়ে এল মেয়েটিকে। কিছু পরেই তার জ্ঞান ফিরল।

শেখ আলাউদ্দিন ছিল ক্ষেতে।

খবরটা তার কাছে পৌঁছেছে। আলাউদ্দিন ছুটে এল। জড়িয়ে ধরল বিশেকে। আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাল—বিশে বড় হোক। তারপর নূরজাহানকে নিয়ে ঘরে ফিরল।

এর পরই এল বিশের জীবনে পরিবর্তন।

জমিদার কেশবদাস দত্তর কাছে খবরটা পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে নগেন পালের ডাক পড়ল কাছারী বাড়িতে।

নগেন পাল হাজির দিল কাছারী বাড়িতে।

সঙ্গে বিশেও ছিল। জমিদারবাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছেন। নগেন পালকে বসতে বললেন। হাতজোড় করে নগেন পাল মাটিতে স্থান নিল। পিছনে দাঁড়িয়ে বিশে।

জমিদারবাবু একমনে তামাক টানছেন।

ব্যাপার দেখে নগেন পাল ভয় পেল। ভাবল হয়ত বা কোন পরোয়ানা আছে। তাকে নিশ্চিন্ত করে জমিদারবাবু কথা বললেন—নগেন, তোমার ছেলের বয়স কত ?

নগেন জানাল—হুজুর দশ বছর মাত্র। ওর যখন ছ'বছর বয়েস তখন ওর মা মারা যায়। তারপর চার বছর হয়ে গেল।

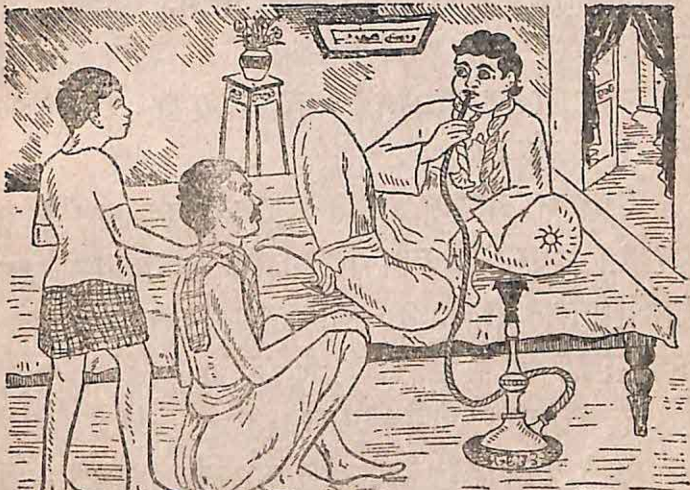
জমিদারবাবু বলেন—এই অল্প বয়সে তোমার ছেলের সাহসের কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়েছি। শুনলাম ও নাকি একটা ডুবন্ত মেয়েকে বাঁচিয়েছে। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

নগেন পাল হাত কচলে বলল—হুজুর ওর সাহস খুব। কিছুতে ভয় পায় না। ওর কাণ্ড দেখে আমার খুব ভয় হয়। ওই আমার সব।

জমিদারবাবু আশ্বাস দেন।

বলেন—ভয় পাবার কি আছে নগেন। এত ভাল কাজ। আমার প্রজা হয়ে তোমার ছেলে যে কাজ করেছে তাতে আমি গর্ব্ববোধ করছি।

হঠাৎ বিশে বলে ওঠে—কেউ না বাঁচালে নূরজাহান ডুবে যেত বাবা।



"কেউ না বাঁচালে নূরজাহান ডুবে যেত বাবা"

দশ বছরের বালকের মুখে এ ধরনের কথা শুনে জমিদার কেশবদাস দত্ত অবাক হয়ে যান।

তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসেন। বিশেকে ডেকে কাছে বসান।

নগেন পালের কাছে খবর নেন।

জানতে পারেন বিশে পড়াশুনা করে। তাঁরই তৈরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশুনাতেও সে ভাল।

জমিদারবাবু জানালেন—নগেন, আজ থেকে তোমার ছেলের পড়াশুনার ভার আমি নিলাম। তোমার ছেলের মধ্যে যে শক্তি আছে আমি আজ তা দেখতে পাচ্ছি।

আনন্দে নগেন পালের মুখ থেকে বেশী কথা বেরোয় না। জমিদারবাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে কেবল বলল—আপনার দয়া পেয়ে ছেলেটা যদি মানুষ হয় হুজুর।

নগেন পাল বাড়ী ফিরল।

ছোট ঘরখানার সামনের দাওয়াতে বসল। হাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—বিশে যেন মানুষ হয়।

সামনে ধূ ধূ করছে ধানক্ষেত। ধানের চারাগুলো সবে মাথা তুলেছে। বালক বিশের দৃষ্টি

তখন দূরে বহু দূরে ধানক্ষেত পেরিয়ে আকাশটা যেখানে মাটিতে ঠেকেছে।

দাসপুরে আনন্দের ধূম লেগেছে।

হিরুদা প্রবেশিকা পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নগেন পালের বুকটা আনন্দে ভরে গেল। আনন্দে তার দু'চোখ দিয়ে জল বেরোয়। মন পড়ে বিশের মায়ের কথা। আজ যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে দেখত তার বিশে বড় হয়েছে। মানুষ হয়েছে।

নগেন পালের ডাক পড়ল কাছারী বাড়িতে।

ক্ষেত থেকে ফিরেই সে ছুটল জমিদারবাবুর কাছে।

জমিদার কেশবদাস দত্ত গম্ভীরভাবে জানালেন —হিরুকে সদরে যেতে হবে।

নগেন পাল হাত কচলে জানাল—নিশ্চয় যাবে হুজুর। বলুন আপনার কি করতে হবে। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জমিদারবাবু একবার নগেন পালের দিকে তাকালেন। তামাকে টান দিয়ে বললেন—আমার কিছু করতে হবে না নগেন। ওকে মানুষ হতে

হবে। সদরের কলেজে থেকে ওকে পড়াশুনা করতে হবে।

নগেন পাল মুস্কিলে পড়ল।

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে জমিদারবাবু বললেন—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না নগেন। খরচপত্র আমিই দেবো। আমি চাই হিরু মানুষ হয়ে যেন আর পাঁচজনকে মানুষ করতে পারে। হয়ত সেদিন আমি থাকব না। কিন্তু হিরু থাকবে। থাকবে ওর আদর্শ।

কলেজেই হিরুদার সঙ্গে আমার পরিচয়।

একই শ্রেণীর ছাত্র হলেও হিরুদাকে দাদা বলতাম। কারণ সে আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। প্রথম দিনেই হিরুদাকে ভাল বেসেছিলাম।

একদিন কলেজে ছাত্রদের বিশ্রাম নেবার ঘরে বসে আছি। হিরুদা এসে পাশে বসল। কোন কথা বলল না। খুব গম্ভীর দেখলাম। ঠাট্টা করে বললাম—হিরুদা তুমি দিনরাত পড়ার চিন্তা করে পাগল হবে। তোমার মত ভাল ছেলে ত বৃত্তি নিয়ে পাশ করবে। তবে এত ভাবনা কিসের?

হিরুদা আমার দিকে তাকাল।

—না তা নয় রে বিনয়। আমি কি ভাবছি জানিস? বাবার মত ক্ষেতে থাকলেই ভাল হত। গরীবের ছেলের পড়াশুনা করা শোভা পায় না।

আমার প্রশ্নের এ রকম উত্তর আশা করিনি।

তাকিয়ে দেখলাম হিরুদার চোখে জল। কাছে সরে গেলাম। বললাম—কি হয়েছে বল ত হিরুদা।

হিরুদা বলল—ছাত্রাবাসে ছেলেরা আমায় বলে জমিদারের পুষ্যি। দেবাশীষকে সবাই ভয় করে। দেবাশীষ আমায় বলে—হিরু তুই ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করিস কেন? ছাত্রাবাস আমাদের জন্য। জমিদারের পুষ্যি ত রোজ ফিটনে চেপে কলেজে আসবে।

সুব্রত বলে—হিরু তোরাও যদি পড়াশুনা করিস তবে আমরা খাব কি বল? সব চাষা যদি লাঙ্গল ছাড়ে তাহলে ধানক্ষেতগুলো যে ফুটবল খেলার মাঠ হয়ে যাবে। সুব্রতর কথায় অরবিন্দ লাফিয়ে ওঠে। সে বলে—ধর কারখানার কুলি-গুলো যদি রাতারাতি পণ্ডিত হয়ে যায় তাহলে কি হবে বলত হিরু?

আমি বললাম—তুমি ওদের কিছু বল না? তোমার মত ছাত্র শুধু শুনে যায়?

আমার কথায় হিরুদা বলল—ওরা যে সব একজোট হ'য়েছে। তুই কি বলতে চাস বিনয় ওদের সঙ্গে ঝগড়া করব? আমরা সব এক শ্রেণীর ছাত্র। ঝগড়া মারামারি করলে আমরা যে নিজেদেরই ছোট করব। এতে আমাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে।

এমন সময় ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল।

আমরা উঠে পড়লাম।

একদিন ক্লাসে একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

হিরুদাকে নিয়ে অধ্যাপক মহাশয়ও বিচলিত হয়ে পড়লেন।

সেদিনের পড়ার বিষয় ছিল নাগরিকত্ব।

নাগরিকদের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় বোঝাচ্ছিলেন।

হিরুদা উঠে দাঁড়াল।

অনুমতি চাইল অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে। সে কিছু বলবে।

তিনি অনুমতি দিলে হিরুদা সুরু করল।

প্রবল আবেগে হিরুদার গলা কাঁপছিল। তবু সে বলল—মহাশয় নাগরিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি যা বললেন সেটাই কি সব? অধিকার এবং পুস্তকে লেখা দায়িত্ব ও কর্তব্যই কি সুস্থ নাগরিকের একমাত্র পরিচয়?

অধ্যাপক মহাশয় বললেন—না ঠিক সব নয়। কেন?

তুমি কি বলতে চাও হিরণ্ময়?

হিরুদা থামল না।

বলে চলল—মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া কি সভ্য নাগরিকের কর্তব্য নয়? রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকা নাগরিকের কর্তব্য। সেই নাগরিক যদি মানুষকে ছোট করে তাতে কি তার কর্তব্য-হানি ঘটে না? হিরুদা আর বলতে পারল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অধ্যাপক মহাশয় এগিয়ে এলেন।

দাঁড়ালেন হিরুদার পাশে। তার পিঠে হাত রেখে তিনি জানতে চাইলেন—তোমার কি হয়েছে বলত হিরণ্ময়? চোখে জল কেন?

হিরুদা নিজেকে চাপতে পারল না।

অঝোরে কাঁদতে লাগল। সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি হিরুদার দিকে। সকলেই জানতে চায়। ব্যাপার কি!

ঘটনাটা ঘটেছিল আগের দিন বিকেলে।

হিরুদার কলেজ থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল। এমনটা প্রায়ই হয়। ছুটির পর হিরুদা লাইব্রেরী ঘরে যায়। প্রয়োজনীয় বই নিয়ে আলোচনা করে।

ছাত্রাবাসে ফিরতে নকুল ঠাকুর জানাল—হিরুদা আপনার বাবা এসেছিলেন। আনন্দে হিরুদা এগিয়ে গেল। বিশ্রাম নেবার ঘরে ঢুকল। কেউ নেই। বলল—বাবাকে কোন্ ঘরে বসিয়েছ নকুল?

নকুল কোন উত্তর দিতে পারেনি।

কেবল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নগেন পাল এসেছিল।

ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। দেবাশীষ ও সুব্রত বাইরে যাচ্ছিল। পরনে ন'হাতি ধুতি, গায়ে গেঞ্জী ও গামছা কাঁধে নগেন পালকে দেখে তারা থমকে দাঁড়াল। নগেন পাল গ্রাম থেকে সোজা হেঁটে

আসছে। আদরের বিশেকে দেখতে। তার ধূলোপুরু পায়ের দিকে তাকিয়ে দেবাশীষ নাকে রুমাল চাপা দিল।

নগেন পাল হাতজোড় করে প্রশ্ন করল—হুজুর বিশে আছে ?

দেবাশীষ রুক্ষভাবে উত্তর দিল—বিশে !

সে আবার কে ? এখানে বিশে বলে কেউ নেই। অনুমতি নিয়ে তুমি এখানে ঢুকেছ ?

নগেন পাল ভয় পেল।

তবু আশা ছাড়েনি। আগ্রহ নিয়ে জানাল—বিশে মানে হিরণ্ময় আমার ছেলে হুজুর।

সুব্রত ব্যঙ্গ করল—হিরু তোর ছেলে ?

তা এখানে ঢুকেছিস কেন ? গেটের বাইরে দাঁড়া। ছেলে যখন ফিরবে দেখা পাবি।

দেবাশীষ হরি সিংকে ধমকাল।

তুই কেন গেট খোলা রাখিস। এটা কি কুলি মজুরদের আড্ডাখানা ভেবেছিস।

নগেন পাল শেষ চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু হরি সিং তাকে শেষ করতে দেয়নি। বাবুদের আদেশ সে পালন করেছিল।

নগেন পাল দাঁড়াতে পারেনি।

কাঁধের গামছায় চোখ মুছতে মুছতে গ্রামের পথ ধরল।

অধ্যাপক মহাশয় সব শুনলেন।

মাথা নিচু করে নিজের আসনে ফিরে এলেন। সকলের দৃষ্টি দেবাশীষ ও সুব্রতর দিকে। সেদিন আর পড়া হ'ল না।

অধ্যাপক মহাশয় বললেন—দেবাশীষ ও সুব্রত!

তোমাদের আচরণকে অপরাধ বলব না। এটা তোমাদের অশিক্ষা। অজ্ঞানতা। তোমাদের নৈতিক চরিত্রের অভাব আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। হিরণ্ময় আজ যে প্রশ্ন এনেছে তা নাগরিক কর্ত্তব্যবোধের তালিকায় নেই। কিন্তু এটাই সুস্থ নাগরিক মনের গোড়ার কথা।

তিনি আরও বললেন—তোমরা এখানে এসেছ লেখাপড়া করতে। কিন্তু আসল শিক্ষা কি জান? মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া। মানুষকে যদি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে না পারি তাহলে আমাদের শিক্ষার কোন মূল্য নেই।

আমরা নিজ নিজ যোগ্যতার দ্বারা কাজ করি।

কাজের বিচারে কাউকে ছোট ভাবা, ঘৃণা করার মনোভাব দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। পৃথিবীর যে সব দেশ বড় হয়েছে সেখানে একজন নাগরিক আর একজনকে ঘৃণা করে না। তবেই সে সব দেশ বড় হতে পেরেছে। আমরাও স্বাধীন দেশের নাগরিক। এখানে শ্রেণীভেদ, জাতিভেদের প্রশ্ন



"কাজের বিচারে কাউকে ছোট ভাবা, ঘৃণা করার মনোভাব দেশের পক্ষে ক্ষতিকর"

নেই। সুস্থ ও সভ্য নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে তার যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া।

তোমাদের ওপরই একদিন দেশের ভার পড়বে। আমি আশা করব তোমরা অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখে নিজেদের সুশিক্ষিত করে তুলবে।

কলেজে ছাত্রসংস্থা থাকে।

আমাদের কলেজেও ছিল। প্রতি বছর একবার ছাত্রসংস্থার নির্ব্বাচন হয়। ছাত্ররা ভোট দিয়ে সভ্য নির্ব্বাচন করে। নির্ব্বাচিত সভ্যরা ছাত্রসংস্থা পরিচালনা করে। এই পরিচালন-ভার হাতে নেবার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে একবার দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলি শেষে উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ নিল। বিভিন্ন দলের সভ্য নির্ব্বাচন নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয়।

আদর্শবাদী হিরুদা সহ্য করতে পারল না।

একদিন এক ছাত্রসভায় হিরুদা উঠে দাঁড়াল। বলল—আজ আমরা ছাত্র। এখানে আমরা এসেছি শিক্ষালাভ করতে। আমাদের আচরণে যদি কোন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় তাহলে আমরা দেশের ছাত্রসমাজের ওপর কলঙ্ক লেপন করব।

হিরুদা বলে চলল—ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। ছাত্রসমাজের কলঙ্ক আমাদের দেশের

ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করবে। ছাত্রসংস্থার নির্ব্বাচনের আগে আমাদের জানা দরকার এই সংস্থার আদর্শ কি। এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। তা যদি জানতে পারি তাহলে ছাত্রসংস্থার নির্ব্বাচন নিয়ে আমাদের মধ্যে যে নোংরামি এসেছে তা আর থাকবে না।

ছাত্রসংস্থার উদ্দেশ্য কেবল সুখ সুবিধা ও কাজ পরিচালনা নয়। ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক।

আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপায়ে তৈরী হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে আমরা সদস্য নির্ব্বাচিত করে পাঠাই। নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সেই সরকার ভারতের সত্তর কোটি নাগরিকের ভাগ্য পরিচালনা করেন।

ছাত্রসভা নিস্তব্ধ।

হিরুদা বলে চলে—ছাত্রসংস্থাও গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা গঠন করি। ছাত্রদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যরা সংস্থার ভার গ্রহণ করেন।

হিরুদার কথার মাঝে একজন ছাত্র উঠে দাঁড়াল। সে বলল—দেশের শাসন পরিচালনার জন্য নির্ব্বাচন হয়। নির্ব্বাচন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্রসংস্থার নির্ব্বাচন নিয়েই বা প্রতিযোগিতা হবে না কেন ?

হিরুদা উত্তরে বলল—প্রতিযোগিতা অবশ্যই হবে।

গণতন্ত্র আমাদের সে শিক্ষা দেয়। কিন্তু যে প্রতিযোগিতার মধ্যে কলহ বিবাদ এবং নোংরামি থাকে তাকে প্রতিযোগিতা বলব না। বলব উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকে আদর্শ। আর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ।

হিরুদা আরও বলল—ছাত্রসংস্থার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বাড়ান। আজ আমরা ছাত্র। আগামী দিনে আমাদেরই ওপর আসবে স্বাধীন ভারতের কোটি কোটি নাগরিকের ভাগ্য পরিচালনার ভার। সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। ছাত্রসংস্থার আদর্শ হচ্ছে সে শিক্ষার হাতেখড়ি।

পাঁচ বছর কেটে গেল।

সময় কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকেনি। পড়াশুনা শেষ করে চাকরিতে ঢুকলাম।

একবার থানায় খবর এল।

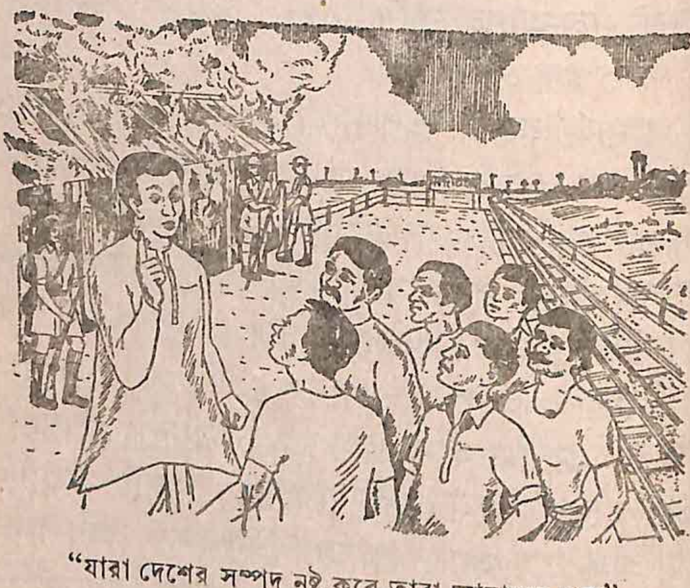
নন্দীগ্রামে হাঙ্গামা হয়েছে। একদল জনতা রেলষ্টেশনে আগুন লাগিয়েছে।

যেতে হল নন্দীগ্রাম।

আশ্চর্য্য হলাম হিরুদাকে দেখে। শুনেছিলাম অবশ্য সে কোন এক গ্রামে শিক্ষকতা করছে। নন্দীগ্রাম রেলষ্টেশনের এক প্রান্তে—হিরুদা দাঁড়িয়ে। ষ্টেশন ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হিরুদাকে ঘিরে কিছু লোক উপস্থিত রয়েছে।

হিরুদা জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলছে—তোমরা এগ্রামে বাস কর। তোমাদের কল্যাণের জন্যই এ রেলষ্টেশন তৈরী হয়েছে। আমার সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে না বুঝে আমরা নিজেদের কত ক্ষতি করি। আজ যারা ষ্টেশন ঘরে আগুন লাগিয়েছে তারা বলতে পার এটা কাদের অর্থে তৈরী হয়েছে? আমাদের অর্থে দেশের অগ্রগতির জন্য যাকিছু

গড়ে তোলা হচ্ছে জানবে সবই তোমার আমার সকল নাগরিকের অর্থে হচ্ছে। নাগরিকদের অর্থে নাগরিক কল্যাণের জন্য যাকিছু গড়ে তোলা হয় তা সবই দেশের সম্পদ। মনে রাখা উচিত ক্ষুদ্র স্বার্থে যারা দেশের সম্পদ নষ্ট করে তারা আমাদের শত্রু।



"যারা দেশের সম্পদ নষ্ট করে তারা আমাদের শত্রু"

হিরুদা আরও বলল—দেশের সম্পদ নষ্ট করলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না।

কারও বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকলে তার জন্য গণতান্ত্রিক পথ আছে। আমাদের পবিত্র সংবিধান সে পথের সন্ধান দেয়। ভুলে গেলে চলবে না দেশের সম্পদ সৃষ্টি হয় নাগরিকদের অর্থে। নাগরিক কল্যাণের জন্যই তা থাকে।

দু'দিন পর ফিরলাম।

নিজের কর্ম্মস্থল ভরতপুরে। ইচ্ছা না থাকলেও ফিরতে হ'ল। হিরুদাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম সময় পেলে ছুটি নিয়ে আসব।

কথা রেখেছিলাম।

মাস কয়েক পর ছুটি পেলাম। ছুটলাম নন্দীগ্রাম। বর্ষাকাল। কাদামাটি ঠেলে হাজির হ'লাম হিরুদার বাড়ি। তখন বিকেল বেলা। দাওয়ায় বসে আছে হিরুদা। তাকে ঘিরে কয়েক জন গ্রামবাসী বসে আছেন। অনুমান করলাম কোন বিষয়ে আলোচনা চলছে।

হিরুদা হেসে আমায় বসতে বলল।

কথা না বলে আসন নিলাম।

একজন গ্রামবাসী বললেন—সামন্তবাবু কিন্তু কাজটা ভাল করেন নি মাষ্টারবাবু।

হিরুদা জানতে চাইল—কোন্ কাজটা ভুঁইয়াদা।

ভুঁইয়াবাবু জানালেন—ঐ থানা পুলিশ করাটা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে একেবারে থানা পুলিশ। এতে ডাক্তার বাবুর মানটা রইল কোথায়? ছেলে বয়েসে ও রকম দোষ অনেকেরই থাকে। তাছাড়া পুলিশকে বিশ্বাস করতে নেই। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বেণীপ্রাসাদকে নিয়ে।

নন্দীগ্রামের একমাত্র ডাক্তার সুধীর হাজরা। তাঁরই ছেলে বেণী। যুবক বেণীপ্রসাদের গুণ পিতার ঠিক বিপরীত। বেণীপ্রসাদ গ্রামের সকলের কাছে একটি সমস্যা। তার জন্য গ্রামের মেয়েদের পথে বেড়ান দায়। মেয়েদের বিদ্যালয়ের পথে ছিদাম মুদীর দোকানের পাশে অনেক দিনের এক বটগাছ আছে। সকাল বেলা মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায়। সে সময় বেণীপ্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকত ঐ বটগাছটির নিচে। প্রতিদিন। একই সময়ে।

এ নিয়ে গ্রামের মাতব্বররা আলোচনা করত। কেউ সাহস করে বেণীপ্রসাদকে কিছু বলত

না। কিন্তু বৃন্দাবন সামন্ত সহ্য করল না। তার মেয়ে রেখাকে বেণীপ্রসাদ নোংরা কথা বলেছে। বৃন্দাবন সোজা থানায় হাজির হ'ল। নালিশ জানাল দারোগাবাবুর কাছে। সে একটা বিহিত চায় ভুঁইয়া বাবুর কথায় হিরুদা বলল—সামন্তদা কাজটা মোটেই খারাপ করেন নি ভুঁইয়াদা। ভদ্রভাবে ইজ্জত নিয়ে চলাফেরা করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। এদের অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের কাজকর্ম্ম ও চলাফেরার ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। যে দেশের যুবক-যুবতীদের চরিত্র ভেঙ্গে পড়ে সে দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না। আমাদের দেশের শক্তি নির্ভর করছে দেশের যুবক-যুবতীদের ওপর। তাদের নৈতিক চরিত্র যদি দুর্ব্বল হয় তবে একটা গোটা জাতি দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। আজ যদি আমরা বেণীপ্রসাদের চরিত্র সংশোধন করতে না পারি তাহলে গ্রামের আর পাঁচজন যুবকের মধ্যেও এ ব্যাধি দেখা দিতে পারে। তাই বেণীপ্রসাদকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আমরা

মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য আছে। একজনের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করে আর একজনের অধিকার। প্রত্যেকের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করছে প্রত্যেকের অধিকার।

প্রত্যেক নাগরিককে নিয়েই দেশ। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য পালনের ওপরই নির্ভর করে দেশের ভাল-মন্দ। তাই সুস্থ নাগরিকের মধ্যে এ ধরনের অপরাধ থাকা উচিত নয়।

হিরুদা থামল।

আমাকে দেখিয়ে বলল—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ভুঁইয়াদা, এ আমার বিশেষ বন্ধু। বিনয় সরকার। পুলিশ বিভাগে কাজ করে। এখন ভরতপুরে আছে।

ভুঁইয়াবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন।

তিনি হাত জোড় করে বললেন—আমার কথায় রাগ করেন নি ত বিনয়বাবু।

হিরুদাই উত্তর দিল—এতে রাগ করার কিছু নেই ভুঁইয়াদা। পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে একটা অকারণ ভয় আপনার মত অনেকেরই আছে।

তার যে কারণ নেই তা নয়। কিছুদিন আগেও আমরা পরাধীন ছিলাম। বিদেশী সরকার তাদের স্বার্থে পুলিশ বিভাগকে কাজে লাগিয়েছিল। আমাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। সে সব অত্যাচারের ছবি আমাদের মন থেকে এখনও যায়নি।

কিন্তু এখন আর বিদেশী সরকার নেই।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের সরকার আমরাই গঠন করি। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির জন্য আমাদের মত পুলিশ বিভাগও কাজ করে চলেছে। মানুষের মধ্যে শান্তি রক্ষা করাই পুলিশ বিভাগের প্রধান কাজ।

সামন্তদা আজ পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন।

সেও ঐ শান্তির জন্য। বেণীপ্রসাদের জন্য তার মনে শান্তি নেই।

মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শান্তি নেই। পুলিশ বিভাগের কাজ হবে তাঁর মনের অশান্তির দূর করা। শান্তি ফিরিয়ে আনা।

হিরুদা আরও বলল—এক কথায় পুলিশ বিভাগ আমরাই সৃষ্টি করেছি। আমাদের কল্যাণের

মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ত্তব্য আছে। একজনের কর্ত্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করে আর একজনের অধিকার। প্রত্যেকের কর্ত্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করছে প্রত্যেকের অধিকার।

প্রত্যেক নাগরিককে নিয়েই দেশ। প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য পালনের ওপরই নির্ভর করে দেশের ভাল-মন্দ। তাই সুস্থ নাগরিকের মধ্যে এ ধরনের অপরাধ থাকা উচিত নয়।

হিরুদা থামল।

আমাকে দেখিয়ে বলল—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ভুঁইয়াদা, এ আমার বিশেষ বন্ধু। বিনয় সরকার। পুলিশ বিভাগে কাজ করে। এখন ভরতপুরে আছে।

ভুঁইয়াবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন।

তিনি হাত জোড় করে বললেন—আমার কথায় রাগ করেন নি ত বিনয়বাবু।

হিরুদাই উত্তর দিল—এতে রাগ করার কিছু নেই ভুঁইয়াদা। পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে একটা অকারণ ভয় আপনার মত অনেকেরই আছে।

তার যে কারণ নেই তা নয়। কিছুদিন আগেও আমরা পরাধীন ছিলাম। বিদেশী সরকার তাদের স্বার্থে পুলিশ বিভাগকে কাজে লাগিয়েছিল। আমাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। সে সব অত্যাচারের ছবি আমাদের মন থেকে এখনও যায়নি।

কিন্তু এখন আর বিদেশী সরকার নেই।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের সরকার আমরাই গঠন করি। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির জন্য আমাদের মত পুলিশ বিভাগও কাজ করে চলেছে। মানুষের মধ্যে শান্তি রক্ষা করাই পুলিশ বিভাগের প্রধান কাজ।

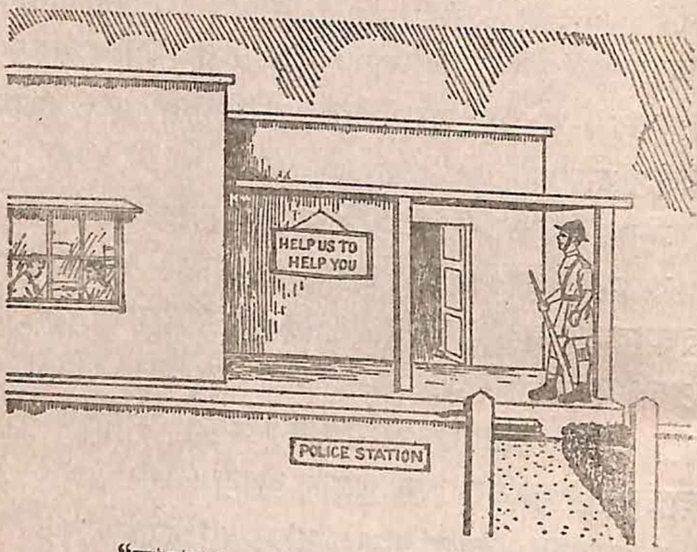
সামন্তদা আজ পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন।

সেও ঐ শান্তির জন্য। বেণীপ্রসাদের জন্য তার মনে শান্তি নেই।

মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শান্তি নেই। পুলিশ বিভাগের কাজ হবে তাঁর মনের অশান্তির দূর করা। শান্তি ফিরিয়ে আনা।

হিরুদা আরও বলল—এক কথায় পুলিশ বিভাগ আমরাই সৃষ্টি করেছি। আমাদের কল্যাণের

জন্যই পুলিশ বিভাগ। আমাদের মত আর পাঁচজন নাগরিকই ঐ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।



"আমাদের কল্যাণের জন্যই পুলিশ বিভাগ"

তাই স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে অযথা ভয় না করে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করা। ঐ বিভাগকে যথাযথ সাহায্য করা এবং প্রয়োজনে সাহায্য নেওয়া। তবেই নাগরিকদের মধ্যে শান্তি বজায় থাকবে।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল।

ফিরে এলাম বর্ত্তমানে।

কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ আমি কর্ম্মরত। শান্তিরক্ষক।

হিরুদা তখনও বলে চলেছে—আমাদের মধ্যে সংকীর্ণতা এসেছে! ক্ষুদ্র স্বার্থে আমরা এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদ করছি। এতে প্রমাণ হয় আমরা ইতিহাসকে ভুলে যাচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের। যাঁরা সব কিছু ত্যাগ ক'রে, জীবন দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছে। আজ আমরা একে অপরকে ঘৃণা করছি। একের বিরুদ্ধে আর একজন নাগরিক অস্ত্র ধরতে লজ্জা বোধ করছে না।

দু'শ বছর আগের কথা।

সে সময় আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করেছিলাম। ভারতবর্ষের এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। এক অঞ্চলের লোক আর এক অঞ্চলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। বিদেশীরা আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ

করেছিল। আমাদের দুর্ব্বলতাই ছিল বিদেশীদের মূলধন। তারা আমাদের একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করেছিল। আমাদের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও আঞ্চলিক স্বার্থ তাদের দিয়েছিল ভারতবর্ষের সিংহাসন। পরিবর্ত্তে আমরা পেয়েছিলাম পরাধীনতার শিকল।

অতীতের ইতিহাসকে ভুলে গেলে আমরা



"আগে আমরা ভারতীয়। তারপর প্রদেশবাসী"

নিজেদের বিপদ ডেকে আনব। আমাদের মনে রাখা উচিত আগে আমরা ভারতীয়। তারপর

প্রদেশবাসী। আমাদের পবিত্র ভারতভূমির একজন সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন—হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামানবের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল

ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত— "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর।"

হিরুদা আরও বলল—আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। দু'শো বছর সংগ্রাম করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের হাতে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আমাদের ওপর রয়েছে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার দায়িত্ব। পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য এনেছেন স্বাধীনতা। আর আমাদের কাজ হবে আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য দেশকে গ'ড়ে তোলা। একথা ভুললে চলবে না শুধু নন্দীগ্রাম নিয়েই ভারতবর্ষ নয়। হাজার হাজার নন্দীগ্রামের মিলনেই আমাদের দেশ স্বাধীন ভারতবর্ষ।

আমাদের মধ্যে নাগরিক একতাবোধ আনতে হলে, ভারতবর্ষের সংহতি রক্ষা করতে গেলে দরকার জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষার ঐক্য। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষার মিলনেই ভারতবর্ষ। আমরা

বিভিন্ন জাতি ধর্ম্ম ও ভাষার চল্লিশ কোটি নাগরিক আমাদের পবিত্র তিন-রঙা জাতীয় পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের মধ্যে যদি অনৈক্য দেখা দেয় তাহলে আমাদের আশ্রয় আমাদের জাতীয় পতাকা একটা দমকা হাওয়ায় উড়ে যাবে।

হিরুদা থামল না।

বলে চলল—যে সংকীর্ণতা ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ আমাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করে তা দূর করতে গেলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। সে শিক্ষা অপরকে বোঝাবার শিক্ষা। দূরকে কাছে নেবার শিক্ষা চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে একটি বলয়ের মধ্যে দিয়ে দেখবার শিক্ষা।

হিরুদা শেষ করল।

জনতার মধ্যে কোন আলোড়ন নেই। নেই কোন উচ্ছ্বাস। উপস্থিত যারা ছিল তারা মাথা নিচু করে নিজের পথে পা বাড়াল।

ঘরে ঘরে তখন শাঁখ বাজছে।

সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনির মধ্যে আমি ভুলে গেলাম নিজেকে। ভুলে গেলাম এক নগণ্য ভাগচাষীর ছেলেকে। হিরণ্ময় পালকে। দেখলাম যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ভারতঋষি। যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে শুনিয়েছিলেন ঐক্যের বাণী—হে



"সদর্পে বলে—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই"
—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর,

সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই; ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

॥ শেষ ॥